৫

রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ (১৯৫২-৫৮)

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্মলাভের পর থেকেই পাকিস্তানী শাসক শ্রেণীর বৈষম্যমূলক নীতি, অগণতান্ত্রিক আচরণ এবং রাজনীতিতে ইসলাম ধর্মের অপপ্রয়োগের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে প্রতিবাদ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ সালে মহান ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে পৃথক জাতিসত্তার ভিত্তিতে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। তারই চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৯৭১ সালে এক গৌরবদীপ্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সংগ্রামী জনতা প্রতিষ্ঠিত করেছে স্বাধীন-স্বার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের পেছনে সক্রিয় ছিল সর্বজনবিদিত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ, যা অবিচ্ছেদ্যভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পরিপুষ্ট করেছিল। ইতিহাসের অনিবার্য ধারায় জাতীয়তাবাদী-আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতি পাকিস্তানী-শাসকচক্রের প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, আমাদের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের প্রতিটি ধাপে প্রেরণা যুগিয়েছে মহান ভাষা-আন্দোলন। নিম্নে রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ (১৯৫২-৫৮) শীর্ষক ইউনিটের পাঠগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল:

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- *পাঠ-১: ভাষা আন্দোলন।*
- *পাঠ-২: ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও ফলাফল।*
- *পাঠ-৩: ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন।*

পাঠ - ১

ভাষা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ভাষা আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস

বাঙ্গালির ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এক রক্তরঞ্জিত ইতিহাস। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালি জাতির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। দীর্ঘ দু'শত বছর শাসনের পর এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালে কেবলমাত্র ধর্মীয় চেতনাকে পুঁজি করে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পাঞ্জাব ভিত্তিক পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতিকে সুনজরে দেখে নি। বাঙালি জাতির উপর আধিপত্য কায়েমের বিশেষ পাঁয়তারা চলছিল। তারা চেয়েছিল বাঙালি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিতে। শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা বিমাতা সুলভ আচরণ করছিল। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে তৎকালীন 'তমদ্দুন মজলিস' সুপরিকল্পিতভাবে সুসংগঠিত আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ১৭ দিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাশেম-এর নেতৃত্বে ১ সেপ্টেম্বর ৩ সদস্য বিশিষ্ট তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়। এ সংগঠনের অন্য নেতৃদ্বয় ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও শামসুল আলম। সূচনালগ্ন থেকেই এ সংগঠনটি বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি উত্থাপন করেছিল। ১৯৪৮ সালে ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেছিলেন।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এ সিদ্ধান্ত জোর করে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। অথচ উর্দু ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা ছিল সমগ্র পাকিস্তানে অনূর্ধ্ব শতকরা ৬.০০ ভাগ। পক্ষান্তরে, বাংলা ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৪.৬ জন। তৎকালীন পাকিস্তানী বিভিন্ন ভাষাভাষীর পরিসংখ্যান ছিল নিম্নরূপ:-

ভাষা	শতকরা হার
বাংলা	৫৪.৬
উর্দু	৬.০
পাঞ্জাবী	৬.১
পশতু	২৭.১
সিন্ধি	৪.৮
ইংরেজী	১.৪

সূত্র: ১৯৫১ সালের আদমশুমারী

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ গঠিত পূর্ব বাংলা মুসলিম ছাত্রলীগ এর ইশতিহারে রাষ্ট্র ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানান হয়। এতে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা সফরে এসে ঢাকার রমনা রেসকোর্সের এক জনসভায় ঘোষণা করেন, "Urdu and Urdu alone shall be the state language of Pakistan" অর্থাৎ উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ ঘোষণার মাত্র তিন দিন পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকায় এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ সমাবর্তন উৎসবে তিনি আবার ঐ ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন। উপস্থিত ছাত্ররা খোলাখুলী ভাবে এ অগণতান্ত্রিক ও অন্যায় ঘোষণার প্রতিবাদ জানায়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের দাবিতে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। পাকিস্তানী স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী পুলিশ বাহিনীকে ছাত্র-জনতার উপর লেলিয়ে দেয়। পুলিশ ছাত্র মিছিলের উপর লাঠি চার্জ করে। ধীরে ধীরে আন্দোলন পরিপক্কতার আকার ধারণ করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" স্লোগানে ঢাকার রাজপথ মুখরিত হয়। শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর তাবেদার পুলিশ বাহিনী গুলি চালায়। ফলে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় বরকত, সালাম, জব্বার ও রফিক এবং নাম না জানা আরও অনেকে। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশে প্রচন্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। গণ-বিস্ফোরণের কাছে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী মাথা নত করতে বাধ্য হয়। তারা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে মেনে নিতে বাধ্য হন। অবশেষে ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

ভাষা আন্দোলন মূলত একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ আন্দোলনের সাথে মিশে আছে শহীদের রক্ত। এ আন্দোলন কেড়ে নিয়েছে বহু বাঙালির প্রাণ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ভূমিকা নিম্নরূপ:

(১) **জাতীয় চেতনা সৃষ্টি:** জাতীয় চেতনা সৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলনের গুরুত অপরিসীম। এ আন্দোলন বাঙালি জাতির ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি নিজেদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক স্বাধীকার সম্পর্কে সচেতন হয়। নিপীড়িত ও গর্বিত বাঙালি জাতির মনে রাজনৈতিক সচেতনতা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে শুরু করে।

(২) **দাবি আদায়:** বাঙালিদের দাবি আদায়ের একটি বিশেষ পদক্ষেপ হল এ আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি বহু ত্যাগের বিনিময়ে জাতীয়তাবাদী দাবি আদায়ের শিক্ষা পায়। তারা ধীরে ধীরে দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। তারা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কায়েমের সংগ্রাম চালিয়ে যাবার লক্ষ্যে দৃঢ় সংকল্প পোষণ করে।

(৩) **একাত্মতা ঘোষণা:** একাত্মতা ঘোষণায় ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী সমাজ জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। ছাত্র, কৃষক, জনতা, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী সকলে একই কাতারে শামিল হয়। ফলে সকলের মধ্যে জাতীয়তাবাদী বন্ধন সৃষ্টি হয়। আর এ একাত্মতাবোধ জাতীয়তাবাদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৪) **শহীদ দিবসের মর্যাদা:** শহীদ দিবসের মর্যাদা ভাষা আন্দোলনের একটি সফল দিক। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি শহীদ দিবসের মর্যাদা উপলব্ধি করতে শিখেছে। এ উপলব্ধি বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

(৫) **সাম্প্রদায়িকতা রোধ:** সাম্প্রদায়িকতা রোধকল্পে ভাষা আন্দোলনের অবদান কম নয়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের মনে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। এ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মনোভাব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরও গতিশীল করে তোলে।

(৬) **পরবর্তী আন্দোলনের ডাক:** ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি পরবর্তী আন্দোলনের ডাক দেয়। ভাষা আন্দোলনের মধ্যে পরবর্তী আন্দোলনের বীজ নিহিত হয়। এ আন্দোলন পরবর্তী আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তোলে। ফলে জাতীয়তাবাদ বিকাশের পথ আরও সুগম হয়।

(৭) **মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুরুত্ব বৃদ্ধিঃ** ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এ আন্দোলনে পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রভাবশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অতীতে এ অঞ্চলে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর দ্বারা রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত। এ পথ ধরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ৭১-এর আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে বাঙালিদের যুক্ত ফ্রন্টের বিজয়, ছয় দফা ও ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয় এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার যুদ্ধে উক্ত আন্দোলনের প্রভাব ছিল অভাবনীয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ২১শে ফেব্রুয়ারি

মহান একুশে চেতনা আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে দৃশ্যমান। নতুন শতকের অতি বিস্ময়কর ও গৌরবদীপ্ত চমক হল বাংলা ভাষার বিজয়। এ চমক নতুন সহস্রাব্দের। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের সাথে এ বিজয়ের স্মৃতি ম্লান। ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কো (UNESCO)-এর বিশ্বব্যাপী ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (International Mother Language Day) পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পেল বাংলা ভাষা। এটি আমাদের অহংকার ও গৌরব।

সারকথা

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙ্গালি জাতিকে সুনজরে দেখেনি। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চের অশোভন ও অযৌক্তিক ঘোষণার সাথে সাথে বাঙালি ছাত্র জনতা দুর্বার আন্দোলনের ডাক দেয়। দীর্ঘ কয়েক বছর সংগ্রামের পর ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপায়ন ঘটে। পরবর্তীতে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। বাঙ্গালিরা এখানে থেমে থাকে নি। অবশেষে ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে UNESCO ঘোষণার মধ্যদিয়ে বাঙ্গালি জাতি মাতৃভাষাকে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করতে সক্ষম হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন

(১) ১৯৫১ সালের আদম শুমারী অনুসারে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল শতকরা –
   (ক) ৫৩.০ ভাগ (খ) ৫৪.৬ ভাগ
   (গ) ৫৫.৬ ভাগ (ঘ) ৫৬ ভাগ

(২) Urdu and Urdu alone shall be the state language of Pakistan - উক্তিটি প্রথম করেছিল –
   (ক) আবুল কালাম আজাদ (খ) আইয়ুব খান
   (গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (ঘ) মঈন খান

(৩) তৎকালীন পাকিস্তানী উর্দু ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল শতকরা –
   (ক) ৬ ভাগ (খ) ৩ ভাগ
   (গ) ৫ ভাগ (ঘ) ৭ ভাগ

(৪) আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি –
   (ক) নভেম্বর ১৯৯৯ সালে (খ) ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে
   (গ) ফেব্রুয়ারী ২০০০ সালে (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরমালা: ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ - ২

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও তার ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা দিতে পারবেন;
- যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং মুসলীমগ লীগের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বিকৃতভাবে ধর্মভিত্তিক চেতনা ব্যবহার করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান দুটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। শুরু থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে সুনজরে দেখে নি। তারা পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করে। তাঁরা পূর্ব বাংলায় তাদের শাসন আর শোষণ টিকিয়ে রাখার জন্য নব নব কৌশল উদ্ভাবন করে। মূলত তারা পূর্ব বাংলায় তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তাদের ছিল বৈরী মনোভাব।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে 'মুসলিম লীগ' বিপুল ভোটে পাকিস্তান প্রশ্নে জয়লাভ করে। নির্বাচন পূর্বে আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু নির্বাচনোত্তর তাদের এ মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটে। নির্বাচনের কয়েকদিন পর, অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল মুসলিম লীগের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এ সম্মেলনে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে সংশোধন আনা হয়। ফলে পূর্ব বাঙ্গলা একটি অন্যতম স্বার্বভৌম রাষ্ট্রের বদলে একটা প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে মাত্র। অবশেষে ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নানা টাল-বাহানা শুরু করে। অহেতুক নির্বাচনের বিলম্ব ঘটায়। অবশেষে পাকিস্তানী সরকার গণচাপের মুখে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষমতাসিন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় ও শক্তিশালী করার জন্য পূর্ব বাংলার বিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়। নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন মাওলানা ভাসানী, শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা। অবশেষে তাঁদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক দল, নেজাম ইসলামি ও গণতন্ত্রী দলের সমন্বয়ে একটি নির্বাচনী ফ্রন্ট গঠন করা হয়। এটিই যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিত।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি

নির্বাচন উপলক্ষ্যে যুক্তফ্রন্ট ২১টি দফা সম্বলিত একটি নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষণা করে। বাংলার আপাময় জনসাধারণ ও ভোটারগণ ২১ দফা দাবির পক্ষে তাদের মূল্যবান রায় দেন। নিম্নে উক্ত ২১ দফার বর্ণনা দেওয়া হল:

(১) বাংলা ভাষা হবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা।

(২) ক্ষতিপূরণ ছাড়া যে কোন প্রকারের জমিদারী প্রথার বিলুপ্তিকরণ। উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন এবং করের পরিমাণ হ্রাস করা।

(৩) পাট শিল্পকে জাতীয়করণের উদ্দেশ্যে পাটের উপযুক্ত ও ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা। মুসলিম লীগ আমলের পাট শিল্পের দালালদের খুঁজে বের করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

(৪) কৃষির উন্নয়নকল্পে সমবায়, শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কুটির শিল্প ও শ্রমঘন শিল্পের উন্নতি সাধন করা।

(৫) লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র উপকূলে লবণ কারখানা প্রতিষ্ঠাকরণ। পূর্বেকার লবণ দালালদের খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়।

(৬) বিশেষ করে শিল্প শ্রমিক ও কারিগরিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

(৭) দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষার জন্য সেচ প্রকল্পের সম্প্রসারণ করা।

(৮) পূর্ব বাংলায় শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্প শ্রমিকদের আর্থিক ও সামরিক নিরাপত্তা বিধান করা।

(৯) দেশের সর্বত্রই প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

(১০) সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থা বিলোপের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসকরণ ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রবর্তন করা।

(১১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কালাকানুন বাতিল করে এটিকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিতকরণ। ছাত্রদের জন্য সহজ লক্ষ্যে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

(১২) প্রশাসনের ব্যয় সংকোচন এবং উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারিদের বেতনে সমতা আনয়ন এবং যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীগণ এক হাজার টাকা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(১৩) দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও আত্মীয় পোষণ বন্ধ করা। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালের পর থেকে সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আয়-ব্যয়ের হিসাব গ্রহণ। বিধিমতে শাস্তির বিধানকরণ।

(১৪) বিভিন্ন অর্ডিন্যান্স ও জননিরাপত্তা আইনে ধৃত সকল বন্দীদের মুক্তি। সংবাদপত্র, সভা-সমিতির অধিকার প্রতিষ্ঠাকরণ।

(১৫) বিচারকার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য বিচার ব্যবস্থাকে প্রশাসন থেকে পৃথক করা।

(১৬) যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রির বর্ধমান ভবনকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগারে পরিণত করা।

(১৭) বাংলা ভাষার সংগ্রামে শহীদের উদ্দেশ্যে একটি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ দান।

(১৮) ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে পালন এবং সরকারি ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা।

(১৯) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্ব প্রদান। দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলো পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে নিয়ে আসা। স্থল বাহিনীর হেড কোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে এবং নৌ-বাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা।

(২০) যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোন কারণে মন্ত্রিসভা বা আইনসভার কার্যকাল বাড়াবে না। আইনসভার মেয়াদ শেষের ৬ মাস আগে মন্ত্রিসভা পদত্যাগের মাধ্যমে নির্বাচনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে সহযোগিতাকরণ।

(২১) আইনসভার কোন সদস্যপদ শূন্য হলে তিনমাসের মধ্যে উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী পর পর তিনটি উপ-নির্বাচনে পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন।

নির্বাচনের ফলাফল

খুব অল্প দিনেই যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় কর্মসূচির পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে। শের-এ বাংলা এ.কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীর ন্যায় জনপ্রিয় নেতৃত্ব পূর্ব বাংলায় নির্বাচনী সফরে নামেন। তাঁরা মুসলিম লীগের ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। যুক্তফ্রন্টের অনুকূলজনমত গড়ে তোলেন। স্বল্পসময়ের মধ্যে পূর্ব বাংলার শ্রমিক কৃষক, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ সকলে যুক্তফ্রন্টের প্রতি সমর্থন এবং মুসলিম লীগকে পরাজিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ:

আসন প্রকৃতি	আসন সংখ্যা	বিজয়ী দল	বিজয়ী আসন সংখ্যা
মুসলিম আসন	২৩৭	মুসলিম লীগ	৯

”	”	যুক্তফ্রন্ট	২২৩
”	”	নির্দলীয়	৪
”	”	খেলাফত রব্বানী	১
অমুসলিম আসন	৭২	কংগ্রেস	২৪
”	”	তফসীলী ফেডারেশন	২৭
”	”	যুক্তফ্রন্ট	১৩
”	”	খ্রিস্টান	১

উৎস: *The Statistical Year Book, 1954-55, Government of East Pakistan Press, Dhaka.*

নির্বাচনের তাৎপর্য

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের তাৎপর্য অপরিসীম। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের রক্ত রাঙা ইতিহাস পেরিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম বিকাশ ঘটে এ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। এ নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

১। **একচেটিয়া কর্তৃত্ব বিলোপ:** নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলায় বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে। সাথে সাথে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এ পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগের একচেটিয়া আধিপত্যের বিলোপ ঘটে।

২। **মুসলিম লীগের ভরাডুবি:** মুসলিম লীগের ভারাডুবির মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। গণপরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি সদস্যরা আর তাদের প্রদেশের সত্যিকারের প্রতিনিধি নন বলে প্রমাণিত হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে এ দলের ভরাডুবি হয়।

৩। **স্বায়ত্তশাসনের সমর্থন:** এ নির্বাচনে স্বায়ত্তশাসনের প্রতি সমর্থন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ নির্বাচনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবির প্রতি বাঙালিদের সমর্থন সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়। তারা নিজেদের ঐক্যের গুরুত্ব ও শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে। এতে বাঙালি জাতীয়তাবোধ ক্রমশ জোরদার হয়।

৪। **প্রতিনিধিত্ব প্রমাণ:** এ নির্বাচনের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টের সদস্যরা তাদের প্রতিনিধিত্ব প্রমাণ করে। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের ফলে তাঁরা শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অংশ নেন। তারা প্রথম গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীল একটি গণপরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।

৫। **বিরোধী দলের বিকাশ:** বিরোধী দলের বিকাশ ৫৪-এর নির্বাচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিরোধী দলের কোন স্থান ছিল না। এ নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো জয়লাভ করে। সুতরাং এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিরোধী দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

৬। **রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি:** রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির মধ্যে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের তাৎপর্য নিহিত। এ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী মাতৃভাষার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের দৃঢ়তা উপলব্ধি করতে পারে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৫৪ সালে উর্দুর সাথে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় মর্যাদা দেওয়া হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। উল্লেখিত বিষয়ের আলোকে এ নির্বাচনের গুরুত্ব স্পষ্ট করে উপলব্ধি করা যায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভাগ্যে নিয়ে আসে অচিন্তনীয় পরাজয়। পক্ষান্তরে যুক্তফ্রন্টের ভাগ্যে নিয়ে আসে অভূতপূর্ব সাফল্য। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১) **পূর্ব বাংলাকে উপেক্ষা:** শুরু থেকেই মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলাকে উপেক্ষা করে আসছিল। তারা কখনও পূর্ব বাংলাকে সুনজরে দেখে নি। মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষার দাবিকে গ্রাহ্য করে নি। তাই '৫৪ এর নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ যুক্তফ্রন্টকে ম্যান্ডেট দেয়।

২) **স্বায়ত্তশাসনের অবজ্ঞা:** স্বায়ত্তশাসনের অবজ্ঞা মুসলিম লীগের ভরাডুবি ও যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের একটি বড় কারণ। পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তাদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি দৃঢ় সমর্থন দেখায়।

৩) **অভ্যন্তরীণ কোন্দল:** অভ্যন্তরীণ কোন্দল মুসলিম লীগের পরাজয়ের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। মুসলিম লীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে পূর্ব বাংলায় এ দলের সাংগঠনিক তৎপরতা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে মুসলিম লীগের সর্বনাশ ডেকে আনে এবং যুক্তফ্রন্টের সাফল্য ঘটে।

৪) **ঔপনিবেশিক মনোভাব:** ঔপনিবেশিক মনোভাবের কারণে '৫৪ -এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের চরম পরাজয় ঘটে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে অবজ্ঞা করে আসছিল। মুসলিম লীগের তৎপরতায় তারা পূর্ব বাংলাকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করতে চেয়েছিল। এরূপ মনোভাবের কারণে ৫৪-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় এবং যুক্তফ্রন্টের বিজয় অর্জিত হয়।

৫) **বিরোধী মনোভাব:** মুসলিম লীগের বিরোধী মনোভাবের কারণে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পথ সুগম হয়। অন্যদিকে মুসলিম লীগের বিজয়ের দ্বার রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এ দল নির্বাচনে তাদের পরাজয় অনিবার্য মনে করে বিরোধী নেতা ও কর্মীদের প্রতি অত্যাচার চালায়। ফলে তারা নির্বাচনে পরাজয় বরণ করে।

৬) **অর্থনৈতিক ব্যর্থতা:** '৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে অর্থনৈতিক ব্যর্থতায় পেয়ে বসে। এ নির্বাচনের পূর্বে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক অর্থনৈতিক অবনতি ঘটে। ক্ষমতাসীন দল হিসেবে মুসলিম লীগ এ ব্যর্থতা রোধে ব্যর্থ হয়। ফলে নির্বাচনী রায় তাদের প্রতিকূলে এবং যুক্তফ্রন্টের অনুকূলে যায়।

৭) **বিচ্ছিন্ন মনোভাব:** নির্বাচনের আগে মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্ন মনোভাব গড়ে ওঠে। এ দল জনগণের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে নি। জনগণ তাদের এ বিচ্ছিন্ন মনোভাব উপলব্ধি করতে পারে। ফলে তাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়।

৮) **নির্বাচনে বিলম্ব:** বিলম্ব নির্বাচন মুসলিম লীগের পরাজয়ের জন্য দায়ী। এ নির্বাচনে ১৯৫১ সালে হবার কথা ছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ এ নির্বাচনে অহেতুক বিলম্ব ঘটায়। তারা সময়মত এ নির্বাচন হতে দেয় নি। ফলশ্রুতিতে যুক্তফ্রন্টের অনুকূলে জনমত গড়ে উঠতে থাকে।

৯) **শাসনতন্ত্র প্রণয়ণে ব্যর্থতা:** যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং মুসলিম লীগের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হল শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যর্থতা। প্রথম গণপরিষদের উপর মূলত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এ গণপরিষদের অধিকাংশ সদস্য ছিল মুসলিম লীগের। এ ব্যর্থতার কারণে মুসলিম লীগ নির্বাচনে পরাজয়বরণ করে।

সুতরাং বলা যায় যে, উপরিউক্ত বিষয়গুলোর কারণে '৫৪-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে। পক্ষান্তরে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পথ সুগম হয়।

সারকথা

১৯৫৪ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এটিই হল প্রথম নির্বাচন যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তাদের একাত্মতা প্রকাশ করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে মুসলিম লীগ বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে আসছিল। এ নির্বাচনের পূর্বে বিরোধী দলগুলো - আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলামি পার্টি একাত্মতা ঘোষণা করে। তারা যুক্তফ্রন্টের ছায়াতলে একাত্রিত হয়। ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই ছিল এ ফ্রন্টের মূল উদ্দেশ্য। নির্বাচনের পূর্বে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে তারা তাদের অনুকূলে নির্বাচনী প্রচারণা চালায়। অবশেষে যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব সাফল্য ঘটে; অন্যদিকে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তাই এ নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ দলের নাম ছিল—

(ক) মুসলিম লীগ (খ) আওয়ামী লীগ

(গ) যুক্তফ্রন্ট (ঘ) কোনটি নয়

২। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি কর্মসূচি ঘোষণা করে—

(ক) ২১টি (খ) ২৩টি

(গ) ২৫টি (ঘ) ২০টি

৩। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট আসন পায়—

(ক) ২০৫টি (খ) ২৫০টি

(গ) ২৪০টি (ঘ) ২৩৬টি

৪। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ আসন পায়—

(ক) ৯ টি (খ) ৫ টি

(গ) ১৩ টি (ঘ) ১৫ টি

উত্তরমালা : ১। গ ২। ক ৩। ঘ ৪। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

(১) যুক্তফ্রন্টের গঠন প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

(২) ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের এবং মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির পটভূমি

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব সাফল্য ঘটে। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তাদের স্বাধীকারের ক্ষেত্রে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করে। পক্ষান্তরে মুসলিমদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে বিভিন্ন দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল খুঁজতে থাকে। কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলায় দমন নীতির আশ্রয় নেন। এ সময় পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমলাদের অভাবনীয় প্রভাব বৃদ্ধি পায়। দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশৃংখলা দেখা দেয়। জনগণের জীবনে অনিশ্চয়তা নেমে আসে। এরূপ পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মন্ত্রিসভায় দ্রুত রদবদল লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক দলগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করা হয়। এভাবে পাকিস্তানে সংসসদীয় গণতন্ত্রের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

সামরিক শাসন জারির কারণ

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়। এ সামরিক শাসন জারির কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ:-

(১) **পার্লামেন্টারি সরকারের ব্যর্থতা:** পার্লামেন্টারী সরকারের ব্যর্থতা ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির প্রথম কারণ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট সরকার বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারে নি। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রবর্তিত সংসদীয় সরকার যথার্থভাবে কাজ করতে পারে নি। ফলে সামরিক শাসন জারী করা হয়।

(২) **উচ্চাকাঙ্ক্ষা** সামরিক নেতাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পথ প্রশস্ত করে। সামরিক বাহিনী আসলে একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠী। প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা নিশ্চিত করা ছিল তাদের প্রধান কাজ। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অনেকদিনের লালিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা।

(৩) **বৃহৎ শক্তির ভূমিকা:** বৃহৎ শক্তির ভূমিকা জারী সামরিক অভ্যুত্থানের একটি বড় কারণ। পাকিস্তানের সামরিক শাসন জারির। চীন-সোভিয়েতে ও মার্কিন দ্বন্দ্বে পাকিস্তান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এ কারণে আমেরিকার ন্যায় বৃহৎ শক্তির ছত্রছায়ায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে।

(৪) **আমলাদের প্রভাব:** পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির অন্যতম কারণ হল আমলাদের প্রভাব। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে আমলারা রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিত। এক্ষেত্রে তাদের সাথে সেনাবাহিনীর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা সেনাবাহিনীকে অভ্যুত্থানে প্ররোচিত করে।

(৫) **মন্ত্রিসভার ভাঙ্গন:** বার বার মন্ত্রিসভার ভাঙ্গন ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের জন্য দায়ী। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠনের অল্প দিনের মধ্যে মন্ত্রিসভাকে ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে পড়ে। ফলে সেনাবাহিনী হয়ে ওঠে আরও শক্তিশালী।

(৬) **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির একটি বিশেষ কারণ। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র কার্যকরী হবার পর পরই মন্ত্রিসভায় রদবদল ঘটে। এরূপ রদবদলের কারণে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়।

(৭) **দুর্নীতি:** দুর্নীতি সামরিক শাসন জারির একটি অন্যতম কারণ। পাকিস্তানের রাজনীতিতেও এর ব্যতিক্রম নয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিশেষ করে প্রশাসনে ব্যাপক দূর্নীতি চলে। এ দুর্নীতির কারণে প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। সামরিক বাহিনী এ অজুহাতে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে।

(৮) **যোগ্য নেতৃত্বের অভাব:** ১৯৫৮ সালে যোগ্য নেতৃত্বের ব্যর্থতার অভাবের কারণে পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর রাজনীতিতে সুষ্ঠু ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভা ভেঙে পড়ে। জনপ্রিয় নেতা এ.কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত নেতাদের রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থানের কারণে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে।

(৯) **মুসলিম লীগের সমর্থন:** ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মুসলিম লীগের সদস্যগণ বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অবশেষে তারা সামরিক বাহিনীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রতি তাদের সমর্থন জানায়।

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের ফলাফল

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের ফলাফল সুদূর প্রসারী। এ শাসনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ:

(১) **শাসনতন্ত্র বাতিল:** ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পরবর্তী প্রথম ফল হল শাসনতন্ত্র বাতিল। সামরিক শাসকগণ ক্ষমতায় এসে প্রথমে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বাতিল করে। প্রেসিডেন্ট এক ঘোষণায় ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করেন।

(২) **রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ:** সামরিক শাসকগণ ক্ষমতাসীন হয়েই রাজনীতিতে বিশেষ ভাবে নজর দেয়। জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতাসীন হয়েই রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নেন। এ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলোকে বরখাস্ত করে। এভাবে তারা রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

(৩) **একনায়কতান্ত্রিক শাসন:** একনায়কতান্ত্রিক শাসন ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। জেনারেল আইয়ুব খান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেই একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব পোষণ করেন। ফলে দেশে এককেন্দ্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সবকিছুই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

(৪) **রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস:** রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে দেওয়া সামরিক শাসনের পরবর্তী রূপ। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সহযোগীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। বিশেষ করে তারা যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন অনিবার্য করে তোলে।

(৫) **মৌলিক গণতন্ত্র প্রণয়ন:** মৌলিক গণতন্ত্র ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পরবর্তী ফসল। জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এভাবে সামরিক সরকার রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

(৬) **মামলা নির্যাতন ও দমননীতি:** ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী অধিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতায় এসে তারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে মামলার জালে আবদ্ধ করেন। মামলা মোকদ্দমা ও নির্যাতন-দমন নিপীড়নের দ্বারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে দূর্বল করে ফেলে।

সারকথা

১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায়। একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে পরবর্তীকালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। জেনারেল

জিয়াউল হক এবং ১৯৯৯ সালে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ক্ষমতা গ্রহণ করে এ সত্যটি আবারও প্রমাণ করেছেন। সামরিক শাসন সুস্থ্য রাজনীতিকে ধ্বংস করে দেয়। ১৯৫৮ সালের পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ক্ষমতাসীন হয়ে সামরিক আইনের মাধ্যমে দেশ শাসন করে। তারা ক্ষমতাসীন হয়ে শাসনতন্ত্র বাতিল, একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করতে থাকে। আইয়ুব সরকার জনগণের অনুভূতি উপলব্ধি করতে না পেরে একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। ফলশ্রুতিতে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হয়। জন্ম নেয় একটি স্বাধীন ও স্বার্বভৌম দেশ যার নাম বাংলাদেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। ১৯৫৮ সালের কোন তারিখে পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে ?

(ক) ৭ মার্চ (খ) ৭ অক্টোবর
(গ) ১৬ ডিসেম্বর (ঘ) ২৭শে অক্টোবর

২। তৎকালীন সামরিক শাসক ছিলেন—

(ক) মঈন খান (খ) ইস্কান্দার মীর্জা
(গ) আইয়ুব খান (ঘ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

৩। সামরিক শাসকগণ ক্ষমতাসীন হয়ে প্রথমে বাতিল করেছিল—

(ক) শাসনতন্ত্র (খ) মন্ত্রিসভা
(গ) যুক্তফ্রন্ট (ঘ) সবকয়টি

উত্তরমালা: ১। খ ২। গ ৩। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

(১) ১৯৫৮ সালের পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক শাসন জারির পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

(১) ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।

(২) "সামরিক শাসন দেশের মঙ্গলের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করে" - ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রেক্ষিতে এ উক্তিটি আলোচনা করুন।